মেহেরপুরে রিনিউয়েবল এনার্জি ফেস্ট উপলক্ষে সচেতনতামূলক র্যালি

রিনিউয়েবল এনার্জি ফেস্ট ২০২৫ উপলক্ষে মেহেরপুরে এক সচেতনতামূলক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২১ এপ্রিল) সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে গিয়ে শেষ হয়।

সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে এবং একশনএইড বাংলাদেশ, বুয়েট ও জাস্ট এনার্জি ট্রানজিশন নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ (জেটনেট-বিডি)-এর সহযোগিতায় এই র্যালির আয়োজন করা হয়।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ক্যাব মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিক-উল-আলম, ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক ও আরটিভির জেলা প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অব হিউম্যান রাইটস (এসপিএইচআর)-এর নির্বাহী পরিচালক আবু আবিদ, পল্লী জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক গোলাম কিবরিয়া, ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি মনিরুল ইসলাম, হেলফ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক দিলারা জাহান এবং অপাজিতা মেহেরপুর-এর নির্বাহী পরিচালক রেহেনা খাতুন।

র্যালিতে শতাধিক নাগরিক, নারী ও যুবা নেতৃবৃন্দ, পরিবেশকর্মী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। তারা “সৌর-বায়ু শক্তিই ভবিষ্যৎ”, “জ্বালানি রূপান্তরে নারী-যুবার অংশগ্রহণ চাই” এবং “রিনিউয়েবল এনার্জি ফেস্ট ২০২৫ সফল হোক” এই ধরনের নানা স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার বহন করেন।

র্যালি শেষে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা, নীতিগত সংস্কার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম বলেন, “জ্বালানি খাতের টেকসই রূপান্তর শুধু সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়; এর জন্য সমাজের প্রতিটি স্তরের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এই র্যালি সেই প্রয়াসেরই সূচনা।”

কন্টক পথ পাড়ি দিয়ে যেতে চাই বহুদুর -ইয়াদুল মোমিন

সীমান্তবর্তী ছোট একটি জেলা মেহেরপুর। স্বাধীনতার সূতিকাগার খ্যাত ঐতিহাসিক জেলা মেহেরপুর। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পেরিয়ে নতুন বাংলাদেশে এখনও বৈষম্য এ জেলার উন্নয়নে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, কলকারখানা, শিক্ষা ব্যবস্থাতেও এখনও বৈষম্যর শিকার হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এমন একটি জেলাতে অনেক নেই এর মধ্যে আছে আমাদের গৌরব করার মত একটি দৈনিক। আমি মেহেরপুর প্রতিদিনের কথা বলছি। পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে কথা বলছি। একজন সংবাদকর্মী হিসেবে কথা বলছি। কথা বলছি মেহেরপুরের একজন নাগরিক হিসেবে। আমি এখন অবশ্যই গর্ব করি আমার জেলাতে একটি দৈনিক পত্রিকা আছে। যেখানে আছে অনেক অসঙ্গতি, কিন্তু অনেক অসঙ্গতির মধ্যেও প্রতিদিন একটি দৈনিক পাঠকের হাতে পৌছাচ্ছে পত্রিকা কতৃপক্ষ। ২০১৮ খ্রি. থেকে ২০২৫ খি.। সাত বছর পেরিয়ে ৮ম বছরে আমাদের প্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন। অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে একটি বৈষম্যহীন, উন্নয়নশীল, অসঙ্গতিমুক্ত একটি জেলাকে আলোকিত করার চেষ্টা আমাদের প্রতিনিয়িত। কতটুকু পারবো, কতটুকু পেরেছি এ বিচারের ভার মেহেরপুরের আপামর জনগণের, আমাদের সকল স্তরের পাঠকের। তবে আমরা এ কন্টাকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে বহু দুরে যেতে চাই।

আমরা গর্বিত আমরা একটি ইতিহাস গড়তে চলেছি। আমরা পেরেছি, আমাদের পারতেই হচ্ছে। আমাদের একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে, তা হলো সব অসঙ্গতিকে দুরে সরিয়ে আমাদের আলোকিত করতেই হবে। এ ধরণের একটি চ্যালেঞ্জ নিতে পেরে মেহেরপুর প্রতিদিনের পরিবারের সদস্য হিসেবে আমি অহংকার করি।

অহংকারের এ যাত্রায় আমাদের সঙ্গে আছেন অগণিত পাঠক আর শুভানুধ্যায়ী। মেহেরপুরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসা আমাদের প্রধান শক্তি। পাঠকসাধারণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে পত্রিকাটি আমরা প্রতিনিয়ত প্রকাশ করে যাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, পাঠকই আমাদের সবচাইতে বড় শক্তি, বড় শ্রদ্ধার জায়গা। তাদের হাতে প্রতিদিন একটি গ্রহণযোগ্য পত্রিকা তুলে দেওয়ার চেষ্টা ৭ বছর ধরে আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছি। আগামী দিনেও এই নিষ্ঠা দৃঢ়ভাবে বজায় রাখব।

‘জনগণের মুখপত্র’ এই স্লোগানের স্বাক্ষর রেখে যা কিছু জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে সে ধরণের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আমাদের সহকর্মীরা নিরলস কাজ করছে।

সংবাদের ভিতরকার সকল সত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। অসততা আমাদের স্পর্শ করতে পারেনি। তবে আমরা নিরপেক্ষ নই। আমরা মানুষের পক্ষে। প্রতিটি সাধারণ মানুষ, প্রতিটি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পক্ষে আমাদের কলম চলবে।

শুধু পত্রিকা প্রকাশ করেই আমরা আমাদের দায়িত্ব শেষ করিনি। মেহেরপুরের খেলাধুলার প্রাণ ফিরিয়ে নিতে আমরা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছি।পত্রিকার পাশাপাশি জাতীয় মানের টকশো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের নানা অসঙ্গতি দুর করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

মেহেরপুর প্রতিদিনের ৮ম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সফল হোক।

প্রসঙ্গ ‘কেয়া পাতার নৌকা’: দাঙ্গা বিধধ্বস্ত বাংলাদেশের

চিত্র -ড. শামস্ আল্দীন

মানব সভ্যতার ইতিহাস আসলে সংগ্রামেরই ইতিহাস। ইতিহাসের ছোট বড় দাঙ্গা যুদ্ধ সবই এই সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। আর কথাসাহিত্যের কারবার যেহেতু মানুষ এবং মানুষের ছোট বড় সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম নানান বিষয় নিয়ে সেহেতু মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া এবং ঘটে চলা সংগ্রামের ইতিহাস ও কথাসাহিত্যে স্থান করে নেয় অনায়াসেই। বিশে^র সমস্ত দেশের কথাসাহিত্য সম্পর্কেই একথা সত্যি। বাংলা কথাসাহিত্য এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা কথাসাহিত্যের আদি থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কথাসাহিত্যের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন দাঙ্গা ও আন্দোলন বারেবারে বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। তবে এখনো পর্যন্ত যে দাঙ্গাটি বাংলা কথাসাহিত্যকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে সেটি হল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মুহূর্তে দেশভাগকে কেন্দ্র করে হিন্দু- মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গা এতটাই ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী ছিল যে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই। এই দাঙ্গা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে খুব অল্প সময়েই তা ব্যক্তি মানুষের মনকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছে। এই দাঙ্গার অভিঘাত এতটাই সুদূরপ্রসারী ছিল যে দাঙ্গা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ব্যক্তি মানুষ তার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়নি। এই দাঙ্গা নারী, পুরুষ, শিশুসহ কেওই বাদ পড়েনি। ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে প্রফুল্ল রায় দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সময়ের এই চালচিত্রকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। সেই বিষাক্ত সময় একটি নারীর জীবনকেও কীভাবে বিষিয়ে দিয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয় কীভাবে এই দাঙ্গা ব্যক্তি নারীর জীবনে ট্রাজিক পরিণতি নিয়ে এসেছে ‘ কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে প্রফুল্ল রায় তা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।
দেশভাগ এবং দেশভাগের অভিঘাত প্রফুল্ল রায়কে যে জীবন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছিল তা এতটাই গভীর ছিল যে সমগ্র জীবন তার প্রভাব থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেননি। মানুষের জীবনের সবথেকে সুন্দর সময় শৈশবের প্রায় পুরোটাই, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কাটিয়েছেন পূর্ববঙ্গে। এরপর দেশভাগের ফলে উদ্বাস্ত হয়ে তাঁকে চলে আসতে হয় কলকাতায়। সে অভিজ্ঞতা মোটেই ভাল ছিল না। একবস্ত্রে পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়। প্রতিমুহূর্তে ছিল খুন হয়ে যাওয়ার ভয়। পূর্ববঙ্গের একশ্রেণির মুসলমান তখন খুনের খেলায় মেতে উঠেছে। রাম দা নিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক মুসলমান প্রতিবেশী হিন্দুদের এই দুর্দিনে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এদের সহযোগিতায় অতি কষ্টে প্রথমে জাহাজে এবং পরে রিফুজি স্পেশাল ট্রেনে উদ্বাস্ত হিসেবে কলকাতায় প্রবেশ করেন তিনি। এরপর জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে। খুব কাছ থেকে দেখেছেন দাঙ্গার কারণে উদ্বাস্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণা। এই গভীর

জীবন অভিজ্ঞতা সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়কে বরাবরই চালিত করেছে। ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসটি লেখকের গভীর জীবন অভিজ্ঞতার ফসল। ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে লেখক অনেকগুলি চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এই চরিত্রগুলি দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভয়াবহ পরিণতিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরে। ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে বিনু, ঝিনুক, যুগল, লারমোর প্রভৃতি চরিত্র, তাদের ক্রিয়াকলাপ এব তাদের পরিণতি তো দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষের চরম পরিণতিকেই মনে করিয়ে দেয়। যে বিনু পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে গিয়ে পূর্ববঙ্গের মাটিকে অন্তর দিয়ে ভালো ভেসে ফেলেছিল সেই বিনুকেই বিনা দোষে কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কাণে রাতের অন্ধকারে ব্যথাহত হৃদয়ে পালিয়ে চলে যেতে হল কলকাতায়। সত্যিই এই চিত্র মর্মান্তিক।
‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে বহু চরিত্রের মধ্যেও আলাদা করে নজরে পড়ে ঝিনুক। বিনুর পাশাপাশি ঝিনুককে অত্যন্ত মমতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন লেখক প্রথম থেকেই। ঝিনুক অভাগী। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সবটা জুড়েই তার উপস্থিতি। উপন্যাস শেষ হয়েছে তার পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যের মাধ্যমে। মানব সংসারে এরকম কিছু চরিত্র থাকে, যারা জন্ম থেকেই অভাগী। বিত্তের কারণে নয় সম্পূর্ণ ভাগ্যের দোষে ঝিনুক সেরকমই একটি চরিত্র। হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কীভাবে তার জীবনকে তিলে তিলে শেষ করে দিয়েছে তারই এক অনবদ্য ছবি অঙ্কিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। উপন্যাসের শুরুতে হেমনাথের সঙ্গে স্টিমার ঘাটে যখন ঝিনুককে প্রথম দেখা যায় তখন তার বয়স মাত্র আট।
“ছোট মেয়েটির চুল কোঁকড়া। নাকটি একটু বোঁচাই হবে। ফুলো
ফুলো নরম লালচে গাল। রূপোর কাজল লতার মতো চোখের কালো
মণি দু’টো টলটল করেছে। একটু নাড়া দিলেই টুপ করে ঝরে পড়বে। নীল ফ্রক লাল জুতোয়, মনে হয়, মোমের পুতুলটি”১
এই নিষ্পাপ কোমল পবিত্র ছোট্ট মেয়েটি তখনও জানে না যে কি ভীষণ দুঃখের ইতিহাস রচিত হতে চলেছে তার জীবনে। বাবা-মায়ের দাম্পত্য জীবনের মিলহীনতার খেসারত দিতে হয়েছে এই ছোট্ট মেয়েটিকে। ঝিনুকের মা অন্য কিছুর প্রতি প্রবল আকর্ষণে শুধু স্বামী ভবতোষকে ছেড়ে যায়নি, ছেড়ে চলে গেছে দুধের শিশু ঝিনুককেও। অভিব্যক্তি শুধু চোখে জল এনে দেয় না, হৃদয়কেও ভারাক্রান্ত করে তোলে। এরপর যখন ভবতোষ ও স্নেহলতার কথোপকথন আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনে নিয়েছে তখন ঝিনুক সত্যিই জেনে গেছে যে তার মা আর ফিরবে না। তখন ছোট্ট ঝিনুকের কান্না পাঠককেও কান্নায় ভাসিয়ে দেয়।
ঝিনুকের জীবনের দুঃখের অধ্যায় এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। ঝিনুক তখনো জানতো না যে কি ভয়ানক দুঃখ তার জন্য অপেক্ষা করে আছ্।◌ে দেশভাগের পর সারা পূর্ব বাংলা জুড়ে শুরু হওয়া সাম্প্রাদিয়ক দাঙ্গার সময় অসুস্থ মাকে দেখতে ঝিনুক বাবা ভবতোষের সঙ্গে ঢাকায় রওনা দিয়েছে। সেখানে গিয়ে তারা ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক

রাখতে চাও, হাজারটা প্রশ্ন উঠবে। লোকে জানতে চাইবে মেয়েটা কে। তোমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। কী জবাব দেবে তখন? শুধু একটা পথ খোলা আছে–’
আবছা গলায় বিনু জিজ্ঞেস করল, ‘কি?’
‘যদি তুমি ওকে বিয়ে কর, সমস্যাটা মিটতে পারে। কিন্তু আত্মীয়রা তোমাদের ত্যাগ করবে। তা ছাড়া, এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করার সাহস কি তোমার আছে?”৪গ
পিতার মুখ থেকে এই কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল বিনুর। অনেক কথাই তখন মনে হল তার। বিষবাষ্পে-ভরা পূর্ব বাংলা থেকে কী নিদারুণ আতঙ্কের মধ্যে ঝিনুককে সীমান্তের এপারে নিয়ে এসেছে, তা শুধু সে-ই জানে। কিন্তু অবনীমোহন তাকে জীবনের সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে দুরূহ সংকটের সামনে দাঁড় করিয় দিয়েছেন। বিপন্ন, দ্বিধাগ্রস্থ, শ^◌াসরুদ্ধ বিনু কী জবাব দেবে, ভেবে পেল না। অবনীমোহন বললেন: “একটা কথা ভেবে দেখতে পার। এ জাতীয় মেয়েদের জন্য গভর্নমেন্টের হোম আছে।
সেখানে আপাতত ঝিনুককে রাখা যেতে পারে।’
বিনু তখন কথা বলার অবস্থায় ছিল না। অবনীমোহন বলে যেতে থাকেন: ‘তুমি ঝিনুকের কাছে যাও।’ এক্ষুনি নয়, সময় নিয়ে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ‘হোম’-এর
ব্যাপারটা বোলো।’
শরীর এবং মন কঠিন আঘাতে অসাড় হয়ে গেছে। নিজেকে ধীরে ধীরে টেনে তুলল বিনু। পাশের ঘরে এসে দেখল, সেটা একেবারে ফাঁকা। সে ডাকতে লাগল, ‘ঝিনুক–ঝিনুক–’ সাড়া নেই।
তেতলার অন্য ঘরগুলো আতিপাতি করে খুঁজল বিনু। কোথাও ঝিনুককে পাওয়া গেল না। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে দোতলায়, তারপর একতলায় নেমে এলো সে। ঝিনুক কোথাও নেই।” ৪ঘ
ঝিনুকের জীবনের এই পরিণতি মেনে নিতে কষ্ট হয়। তার এই পরিণতি কোনমতেই প্রত্যাশিত ছিল না। ঝিনুকের তো কোন দোষ ছিল না। সে তো দাঙ্গাবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অস্থির সময়ের শিকার। কোনভাবেই যেন এর থেকে তার নিস্তার নেই। শুধু ঝিনুকই নয় তার মতো হাজার হাজার নারীকে বাংলাদেশের দাঙ্গা বিধ্বস্ত সেই উত্তাল সময়ে এই নারকীয় যন্ত্রণার শিকার হতে হয়েছে। ইতিহাস বইয়ের পাতায় দু একটি শব্দের খোঁচায় হয়তো বা তার ইতিহাস তুলে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের নারীর জীবনে ঘটে যাওয়া সেই যন্ত্রণাময় ইতিহাস জীবন্ত হয়ে আছে সাহিত্যের পাতায়। যে সমস্ত সাহিত্যিক এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রফুল্ল রায়। তাঁর ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসের ঝিনুক দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের হাজার হাজার ত্রস্ত নারীর প্রতিনিধি।
লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ^বিদ্যালয়

মেহেরপুরের দুই কৃষ্ণ কবি - মুহাম্মদ রবীউল আলম

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভূবনে মেহেরপুরের রয়েছে সুদীর্ঘ ও গৌরবোজ্জ্বল এক ঐতিহ্য। এ অঞ্চলের মাটি যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনে রেখেছে সাহসিকতার ছাপ, তেমনি কাব্যচর্চার ইতিহাসেও রেখেছে এক অনন্য পরিচিতি। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকের আলোচনায় মেহেরপুরের দু‘জন পুরোধা কবির কথা আলোচনা করবো। তারা হলেন মধ্যযুগের সাহিত্যের অনতম কবি কৃষ্ণহরি দাস ও নদীয়ার রাজা গিরিশচন্দ্রের সভাকবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (১১৯৮ বঙ্গাব্দ – ১২৫১ বঙ্গাব্দ)। তারা তাদের কাব্যচর্চার মাধ্যমে মেহেরপুরকে সম্মানিত করেছেন। কবি কৃষ্ণহরি দাস মেহেরপুরকে আলোকিত করে যখন লেখেন ‘কৃষ্ণহরি দাস ভনে বাস মেহেরপুর’, তখন আমাদের গর্বে বুকটা ভরে যায়। অপর দিকে মেহেরপুরের বাড়ীবাঁকা গ্রামের সন্তান কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী যখন নদীয়ার রাজার সভাসদে মুখে মুখে কবিতা রচনা করে সবাইকে তাঁক লাগিয়ে দেন, তখন আমাদের আনন্দে মনটা নেচে উঠে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত এই ধারায় এই দুই প্রাজ্ঞ কবির অবদান মেহেরপুরকে করেছে গর্বিত ও শ্রদ্ধাভাজন।

কৃষ্ণহরি দাস বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষার্দ্ধের কবি ও গীতিকার। তিনি নদীয়ার বনগাঁও জন্ম নিলেও মেহেরপুরে বসবাস করতেন এবং মেহেরপুরে বসে কাব্য চর্চা করে গেছেন। এখানেই তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য পুথি ও গীতিকাব্য। তার কাব্যে উঠে এসেছে বাউল-দরবেশ সংস্কৃতির প্রভাব, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মমতের এক অনন্য সমন্বয় দেখা যায়।

সত্যপীরের পাঁচালী কাব্যের মধ্যে তার রচিত ‘বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি’ বৃহত্তর। তিনি বাউল-দরবেশ সম্প্রদায়ের শিষ্য। তার কবিতায় হিন্দু ও মুসলমানের সমন্নয়মূলক ভণিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তার কবিতায় দেখা যায় বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যপীরকে সংগ্রামী ভূমিকায় আসতে হয়েছে।

কৃষ্ণহরি দাস তার “ভনে বাস মেহেরপুর’ কবিতায় লিখেছেন-‘কৃষ্ণহরি দাস ভনে বাস মেহেরপুর/শতেক বন্দেগী মোর সত্যপীরের পায়/তোমার আদেশে গান কৃষ্ণহরি গায়।/তাহের মামুদ গুরু শামস নন্দন/হরনারায়ন দাসে লেখে রচে কৃষ্ণহরি/
শিরে যার সত্যপীর কন্ঠে বাগেশ্বরী/ পঞ্চমীর পুত্র আমি নাম কৃষ্ণহর ‘।

কৃষ্ণহরি দাস রচিত ‘বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি’-তে “অকুমারী সন্ধ্যাবতী” একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও তাৎপর্যপূর্ণ নারী চরিত্র হিসেবে প্রতিভাত হয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মেহেরপুরে বসবাসকারী এই কবি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধারক হিসেবে সত্যপীরকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি সন্ধ্যাবতীকেও করেছেন এক প্রতীকী নারী-অভিযাত্রী।

রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী উনিশ শতকের এক প্রখ্যাত কবি, যিনি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে হাস্যরসাত্মক ও ছন্দনির্ভর কবিতা রচনার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ১১৯৮ বঙ্গাব্দে মেহেরপুর জেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বাড়ীবাঁকা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবির জন্মস্থানের ইতিহাস এবং সাহিত্যিক ধারা-উভয়ই মিশে রয়েছে তার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে।

বাল্যকাল থেকেই কৃষ্ণকান্ত মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন। এই অসাধারণ প্রাকৃতিক প্রতিভা পরবর্তীতে পূর্ণতা পায় রাজসভায়। দস্যুদের হাতে পৈত্রিক সম্পদ হারিয়ে তিনি জীবিকার সন্ধানে কৃষ্ণনগরে আগমন করেন এবং তদানীন্তন নদিয়া রাজা গিরীশচন্দ্র তাকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তিতে রাজপরিবারের সভাকবির পদে নিযুক্ত করেন।

তিনি সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মুখে মুখে পয়ার, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী ছন্দে কাব্য রচনায় তার ছিল অসামান্য দক্ষতা। কারও দ্বারা উপস্থাপিত যে-কোনো সমস্যা তিনি কবিতায় রূপ দিতে পারতেন মুহূর্তেই। রাজা গিরীশচন্দ্র তার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে “রসসাগর” উপাধিতে ভূষিত করেন।

রসসাগরের সাহিত্যজীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ‘সমস্যা পূরান’, যেখানে তিনি মুখে মুখে সমস্যার সমাধান কবিতার মাধ্যমে করেছেন। তার কাব্যে যেমন ছিল তীক্ষè বুদ্ধি ও রসবোধ, তেমনি ছিল গাঁথুনির নিখুঁত ছন্দ। সমসাময়িক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে

তার ছিল গভীর হৃদ্যতা। একে অপরের প্রশংসায় তারা যে ছন্দ ও কবিতার মাধ্যমে সাড়া দিতেন, তা আজও কাব্যপ্রেমীদের কাছে আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী লিখেছেন, ‘বাঙ্গালীর মত কাঙ্গালী কে আর/বাঙ্গালীর জল বায়ু অতি চমৎকার,-/একবার সেবিলেই চক্ষু অন্ধকার।/ম্যালেরিয়া ছারখার করিল এ দেশ/ধনে প্রাণে ক‘রে দিল মানুষের শেষ।’

জীবনের শেষ পর্বে রসসাগর শান্তিপুরে তার কন্যার কাছে থাকতেন এবং সেখানেই ১২৫১ বঙ্গাব্দে তার মৃত্যু হয়। আজও বাংলা সাহিত্যের রসাত্মক ধারায় রসসাগরের নাম উজ্জ্বলভাবে উল্লিখিত হয়, যিনি ছিলেন একাধারে প্রতিভাবান কবি, ভাষাপন্ডিত এবং রাজসভার আনন্দদাতা।

কৃষ্ণহরি দাস ও রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী-এই দুই কবির সাহিত্য সাধনা কেবল মেহেরপুর নয়, বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকেই করেছে সমৃদ্ধ। একজন মধ্যযুগের পুথিকবি হিসেবে ধর্মীয় সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক, অন্যজন আধুনিক যুগের প্রথমাধ্যে হাস্যরসাত্মক ছন্দের শিল্পী। তাদের জীবন ও কর্ম আমাদের সংস্কৃতির প্রাচীন শিকড়কে নতুন করে চিনতে ও গর্বিত হতে শেখায়। আজকের প্রজন্মকে তাদের সাহিত্য পাঠে আগ্রহী করে তোলা, কেবল অতীতকে জানার জন্য নয়-বরং আগামী দিনের সাহিত্য-সংস্কৃতির পথরেখা নির্মাণে সহায়ক হবে। মেহেরপুরের মুখ উজ্জলকারী মধ্যযুগের সাহিত্যের অনতম কবি কৃষ্ণহরি দাস ও নদীয়ার রাজা গিরিশচন্দ্রের সভাকবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

৭১ এর কোন একদিন

দিন আসে দিন যায় মাস পেরিয়ে আসে নতুন কোন বছর। আবার সে সবই জাগতিক নিয়মে বিলিন হয় মহা অতিতের গর্ভে। ধারাবাহিক সে সময়ের মধ্যে এমন কিছু ক্ষণ, সময় বা ঘটনা হৃদয়ে দাগ কেটে যায় যা কখনো ভুলে যাবার নয় বিস্তৃতি হবার নয়। সে স্মৃতিগুলো বার বারই হৃদয় পটে ভেসে ওঠে ধ্রুপদী চলচিত্রের মতো। এমনই একটি শৈশব স্মৃতি যা আমাকে কখনো হাসায় আবার কখনো বা গভীর বেদনায় কাঁদিয়ে যায়। অনেক

আমার আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এমনকি আজ জীবনের এই সন্ধিক্ষনে এসেও বহুবার চেষ্টা করেও পারিনি মিল করতে। শুধু মনে পড়ে আমার বাবার দুর সম্পর্কের কোন আত্মিয়ের বাড়িতে উঠেছিলাম। তাদের বাড়ির স্বল্পপরিসরে যারপরনায় আন্তরিকতার সাথে তারা ঠায় করে দিয়েছিলো ক্লান্ত অবসাদ মাখা মানুষগুলোকে একটি রাত্রি যাপনের জন্য। আমার ফুপাদের পরিবারসহ আমাদের পরিবারের লোকজন এবং যথারিতি তাদের পরিজন মিলে এক নঙর খানার মতো সৃষ্টি হয়েছিলো সে রাতে।

শেষাবধি আমি এবং আমার এক ফুপাতো ভাই গরুর গাড়ির নিচে বিচালী বিছিয়ে শয়ন করেছিলাম, কিন্তু বিধিবাম দৈবাৎ শুরু হলো প্রকৃতির পাগলামি আকাশ জুড়ে মেঘ, শুরু হলো বৃষ্টি ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমাদের পাশেই ছিলো অপরিচ্ছন্ন খুঁদে একটি রান্না ঘর। আমার ফুপাতো ভাইটি আমার তুলনায় বয়সে বড় ছিলো সে কারনে বুদ্ধিও তার আমার চেয়ে বেশি থাকার কথা। তারই নির্দেশনায় শেষমেষ ঐ রান্নাঘর নামক জায়গাটিতে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু সেখানে ছিলো একটি কুকুর শুয়ে। মনে হলো আজন্ম ঐ জায়গাটি তারই। আমার ফুপাতো ভাইয়ের অত্যাধিক প্রচেষ্টায় কুকুরটিকে অপসারিত করা গিয়েছিলো জায়গা হতে। আমরা ও আমাদের অবসাদক্লিষ্ট শরীরটা এলিয়ে দিয়েছিলাম সেখানে। আবারো চোখের পাতায় ভর করেছিলো ঘুম। সকালে নিদ্রা ভঙ্গ হলে দেখি কুকুরটা আমাদের পাশেই শুয়েছিলো।

লেখক: কবি ও সাহিত্যিক

মানবমুক্তির সংগ্রামে লালন ও ভাসানী

ভূ-ভারতের অধিকাংশ মানুষ আসলে তাড়া-খাওয়া মানুষ। যুগে যুগে তাদের তাড়া করেছে দেশি-বিদেশি শাসক-শোষক এবং রঙ বেরঙের বিভাষী- বিধর্মীরা। সময় কখনও তাদের অনুকূলে ছিল না, এখনও নেই। উনিশ কিংবা বিশ শতকেও তাদের নিগৃহীত-উৎপীড়িত, রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছে। এখনও অবস্থা থৈবচ। আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রবল স্রোতের বিপরীতে সাঁতরে সাঁতরে কূলে ভিড়তে চেয়েছিলেন। কেউ কেউ খানিকটা

সফল হলেও অধিকাংশরা একেবারেই হননি। কারো জন্য বিপরীত স্রোতটা এত তীব্র ছিল যে তা উতরানো সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা সব সময় আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। অদৃষ্টের পরিহাসে যারা এই ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইতিহাস বদলাবার লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন, তাদের সবাইকেই তাড়া খেতে হয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, জিন্নাহ, নেহেরুর মতো লালন, কাঙাল হরিনাথ, নজরুল, ভাসানী, শেরে বাংলা, শেখ মুজিবকেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গোলকধাঁধাঁর ফ্যারে পড়ে তাড়া খেয়ে ফিরতে হয়েছে। ফকির লালন ছিলেন সর্বোতভাবে একজন তাড়া-খাওয়া মানুষ। ধর্মধ্বজি বজ্জাতদের তাড়া খেয়ে তাকে বেছে নিতে হয়েছিল আড়ালটানা মগ্ন সাধকের ব্যতিক্রমী জীবন।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে গান লেখার অপরাধে তাঁকে হয়তো জেলে যেতে হত, যেমন নজরুলকে যেতে হয়েছিল। সাতচল্লিশে দেশভাগের সময় বেঁচে থাকলে তিনি কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে থাকতে পারতেন না, উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমাতে হত। তফসিলি-দলিত সম্প্রদায়ের নেতা যোগেন মণ্ডলকে পাকিস্তান ছাড়তে হয়েছিল। নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র পূর্ববঙ্গে থাকতে পারেননি, রাষ্ট্রনৈতিক কারণে লালনও হয়তো থাকতে পারতেন না। পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী সমাজ তাঁকে মেনে নিত না। কারণ তাঁর গানে-জীবনাচরণে, আদব-কায়দায় হিন্দুয়ানির ছাপ ছিল। তিনি গৌরাঙ্গ, নিতাই, অদ্বৈত ঠাকুরকে নিয়ে গান বেঁধেছেন। তিনি শরা-শরিয়ত মানতেন না, শিরক-বেদাত সমর্থন করতেন। এখন প্রশ্ন, বিশ শতকের গোড়ায় কিংবা তারও দু দশক আগে জন্মগ্রহণ করে বিশ শতকের আশির দশক পর্যন্ত লালন যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি কার মতো হতেন? এর উত্তর হতে পারে, তিনি মওলানা ভাসানীর মতো হতেন অথবা নজরুলের মতো। তবে কমরেড মোজাফফর আহমেদ কিংবা মনি সিং হতে পারতেন না, কারণ এরা ছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট। এদের সহযাত্রীরা ছিলেন লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত।

দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়, ফকির লালন ছিলেন উনিশ শতকের পোড়-খাওয়া, লড়াকু মানুষ। মজলুম জননেতা ভাসানীর মতো লালনের লড়াই ছিল জমিদারতন্ত্র, নীলকর সাহেব, ধন-বৈষম্য, জাতপাত, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও শোষণ-বঞ্চণার বিরুদ্ধে। লালন ও ভাসানী দুজনেই ছিলেন সাদামাটা মানুষ। আচার-আচরণ, চাল-চলন, বেশভূষা, মুখের ভাষা সবদিক দিয়েই তাঁরা ছিলেন একেবারে সাধারণ মানুষ। যে-পারিবারিক পরিমণ্ডলে তাঁরা জন্মেছিলেন, তাতে ওই রকম সাদামাটা, সরল-সহজ হওয়াটাই ছিল

স্বাভাবিক। বরং না-হওয়াই ছিল অস্বাভাবিক। সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের এক কৃষক পরিবারে ভাসানীর জন্ম। শৈশবে বাবা-মাকে হারিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পর্ব চুকে যায়। যে-বালক খুব অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন অনাথ হয়, তিনি বড় হয়ে গভর্নর-মুখ্যমন্ত্রী-মন্ত্রী হবেন এমনটা আশা করা যায়! যায় না। ভাসানীও তেমন কিছু হননি বা হবার সুযোগ থাকলেও হতে চাননি। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করলেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেননি। ভাসানীর মতো লালনেরও কেউ ছিল না, বড় অসহায়, বড় নিঃসঙ্গ ছিলেন তিনি। তাঁর জীবনের গল্পটা ছিল খুবই সাদামাটা, খুবই আটপৌরে। সেই গল্পের ভেতর কোনো জৌলুশ বা চাকচিক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপরও তিনি আমাদের লোকায়ত ইতিহাসের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। লালন এবং ভাসানী অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও দুজনেই অনেক বড়মাপের মানুষ হয়েছিলেন। অসাধারণ রকমের বড়মাপের মানুষ হয়েও আত্মম্ভরিতা, অহমিকা কিংবা উচ্চমন্যতায় ভোগেননি। আমৃত্যু মিশে থেকেছেন দীনহীন, নিঃস্ব, রিক্ত মানুষের সঙ্গে।

লালনের কালে কোনো দলীয় রাজনীতি ছিল না। তাঁর জীবৎকালে অক্টাভিয়ান হিউমের পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও এর শাখা-প্রশাখা তখনও গ্রাম-গঞ্জে বিস্তৃত হয়নি। রাজনীতি থাকলে তিনি হয়তো রাজনীতিতে হতেন। ইতিহাসকে বদলাতে চাইতেন—চাইতেন স্বাধীনতা ও মুক্তি। চাইতেন স্বশাসিত শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন সমাজ। তিনিও ক্ষমতা চাইতেন আর পাঁচজন সংগ্রামী-জননায়কের মতো। কিন্তু সেটা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নয়। ক্ষমতা চাইতেন জাতপাত, শোষণ-বঞ্চণার অবসান ও সর্বজনের কল্যাণের জন্য। ক্ষমতা চাইতেন ধর্মের নামে মানুষ ঠকানোর ব্যবসা রুখে দেওয়ার জন্য। মানুষকে গভীরভাবে ভালবাসতেন বলেই তিনি রাজনীতি করতেন, সেখানে ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান প্রাধান্য পেত না। অন্যায়-অবিচার, বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। প্রতিতুলনা না-করেও বলা যায়, লালন ও ভাসানী দুজনেই ছিলেন সর্বতোভাবে প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী জননায়ক। লালনের লড়াই ছিল প্রচলিত সমাজের অন্ধ অনুশাসনের বিরুদ্ধে, বিদ্যাসাগরও লড়াই করেছেন। লালনের সমকালীন রাজা রামমোহনও সমাজ বদলের জন্য লড়াই করেছেন, তবে তা ছিল কলকাতা মহানগরের মধ্যেই পরিসীমিত। তাঁর লড়াইয়ের সহযোদ্ধারা ছিলেন কলকাতার সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত এলিটরা। ভাসানীর মতো মুজিবও লড়েছেন রাষ্ট্রযন্ত্র ও আধ্যিপত্যবাদী শক্তির নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে। মওলানা ভাসানী রাজনীতি করেছেন সমাজতান্ত্রিক ধারায় শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে, আর মুজিবের রাজনীতি ছিল উদারনৈতিক

গণতান্ত্রিক ধারায় কল্যাণমূলক ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। একাত্তরে দুজনেই ছিলেন দেশদ্রোহী।

মুজিব ছিলেন সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা না করলেও স্বাধীন দেশে তিনি নিহত হয়েছেন। ভাসানী প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হননি, কিন্তু বারবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। কলঙ্ক-অপবাদ নিতে হয়েছে। আসলে রাষ্ট্র কোন বিমূর্ত ধারণা নয়; কিংবা ধূলির ধরণীতে ঈশ্বরের জয়যাত্রাও নয়। এটা ক্ষমতাধর ও শক্তিমানদের স্বার্থরক্ষারী বৃহৎ মানবীয়-প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের মতো প্রচলিত সমাজও প্রাধান্যশালী শ্রেণি বা গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার কাজে লিপ্ত থাকে। ‘সমাজ’ চায় ধর্মের অনুশাসন, সংস্কার, প্রথা-পার্বণ, জাতপাতের দোহাই দিয়ে দুর্বলের উপর নিপীড়নের স্টিমরোলার চালিয়ে যেতে। রাষ্ট্র বা সমাজের কর্তারা বেশ নিষ্ঠুর ও নির্মম। তারা খুন-খারাবি, চুরি-ডাকাতি, লুণ্ঠন-ধর্ষণ সহ্য করে, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের প্রথা, বিধি-বিধান ও অনুশাসনের বিরুদ্ধাচারণকারীকে ক্ষমা করে না। এ কারণে লালন, ভাসানী, মুজিবকে রাষ্ট্রযন্ত্র ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ক্ষমা করেনি। একাত্তরে ওসমানি, জিয়া, তাহেররাও দেশদ্রোহী ছিলেন, পাকিস্তান টিকে থাকলে তারাও ক্ষমা পেতেন না।

বিরূপ পরিবেশে বসবাস করেও লালন ও ভাসানী স্বপ্ন দেখেছেন এবং মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। লালনকে চলতে হয়েছে প্রতিহিংসাপরায়ণ, জাতপাত-কবলিত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে, আর ভাসানীকে রাজনীতি করতে হয়েছে রাষ্ট্রশক্তির হুমকি-ধামকি আর পরোয়ানার বিরুদ্ধে লড়াই করে। রাজনৈতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তিনি অরবিন্দের মতো সিদ্ধপুরুষের জীবন বেছে নেননি। তাঁর রাজনীতি, লড়াই-সংগ্রাম আর অধ্যাত্মচর্চা ছিল একইসূত্রে গাঁথা। লালনের অধ্যাত্মচর্চার মধ্যেও সমাজবিচ্ছিন্নতা ছিল না। তিনিও সমাজে মানুষের ওপর মানুষের নিপীড়নের অবসান চেয়ে লড়াই করেছেন।

লালনের সমকালে অবিভক্ত বঙ্গদেশের অধিকাংশ মানুষ ছিলেন প্রান্তিক কৃষক ও রায়ত। তাদের ওপর জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের অত্যাচার ছিল। কৃষকদের শত্রু যে জমিদার, মহাজন ও নীলকর সাহেবরা কেমন তা তিনি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি ছিলেন জমিদার ও নীলকরবিরোধী। ঠাকুর এস্টেটের জমিদারদের বিরুদ্ধে কাঙাল হরিনাথের সাথে একজোট হয়ে তিনি ও তাঁর শিষ্যরা লড়াই করেছেন। নিঃস্ব রিক্ত, দীনহীন মানুষের কাছাকাছি থেকে তিনি বুঝেছেন যে, গরিব মানুষের শত্রু কেবল বিদেশী বণিক আর রাজপুরুষরাই নন, ইংরেজদের

অনুকম্পাপ্রাপ্ত দেশি জমিদার-মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগী বাবুরাও তাদের শত্রু।

ব্রিটিশ আমলে বঙ্গদেশ ছিল সাতসমুদ্র পারের সাদাচামড়ার রাজপুরুষদের অধীনে, তাদের সহযোগীরা ছিল দেশি জমিদার, সুদখোর মহাজন, মোল্লা-পুরুত আর রক্তচোষা চাঁড়াল নীলকর সাহেবরা। এজন্য লালন একই সঙ্গে ছিলেন সামন্তবাদ, নীলকর ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী। ছিলেন সম্প্রদায়-ঊর্ধ্ব অখণ্ডদৃষ্টিসম্পন্ন ধর্মনিরপেক্ষ-মানুষ। কোনো সম্প্রদায়-গোত্র, মাজহাব বা মোকামের ঘেরটোপে নিজেকে আটকে রাখতে চাননি। ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে সমাজটা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাক, এটা তিনি চাননি। অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বঞ্চণার অবসানে হিন্দু-মুসলমানকে তিনি এক শামিয়ানার নিচে এনে পঙক্তি ভোজন করিয়েছেন। ভেদবুদ্ধিমুক্ত শোষণহীন সমাজ কায়েম করাই ছিল তার আরাধ্য। তিনি বলেছেন: ‘এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে,/ যেদিন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান জাতিগোত্র নাহি রবে।’ গানের মাধ্যমে তিনি আসলে জাতিগোত্রহীন, সমতাভিত্তিক সমাজের ভাবকল্পই সারা জীবন প্রচার করে গেছেন। শোকে-সুখে, হর্ষ-বিষাদে বাংলার কৃষকসমাজ যেমন শিরদাঁড়া টানটান করে মাটিলগ্ন হয়ে থাকে, লালনও তেমনই নিজের মাটি ও মানুষকে ছেড়ে আকাশবিহারী হতে চাননি। লালনের মতো মওলানা ভাসানীও ছিলেন মৃত্তিকালগ্ন সংগ্রামী পুরুষ। দীন-দরিদ্র মানুষকে ভালবেসে কৃষক সমাজকে নিয়ে সারাজীবন পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। বক্তৃতামঞ্চ থেকে জালিম ও জুলুমের বিরুদ্ধে মজলুম হয়ে আগুন ঝরিয়েছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান সফর করেছেন, কিন্তু সর্বত্রই তিনি তার প্রতিবাদী-কৃপাণ শাণিত করেছেন জুলুমবাজদের বিরুদ্ধে। ছিলেন অগ্রসর চিন্তার মানুষ, অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে দল ভেঙেছেন, নতুন দল ‘ন্যাপ’ গড়েছেন, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি কখনোই। লালনও ছিলেন তাই, তিনিও চেয়েছেন মানবমুক্তির নহবত শুনিয়ে সমাজের ভেদাভেদ ঘোঁচাতে।

লালন ও ভাসানী দু জনেই ছিলেন অধ্যত্মসাধক। একজন লোকায়ত ধারার মরমি ফকির, আরেকজন ইসলামি-সুফি প্রবর্তনার পির। দু জনই এসেছিলেন ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে, লালনের শিক্ষা আউল-বাউল-সাঁই-দরবেশ তথা লোকায়ত অধ্যাত্মসাধকদের কাছ থেকে। ভাসানীর শিক্ষা মাদ্রাসা- মক্তব ও কামেল পির-মুর্শিদদের কাছে। লালনের ছিল শত শত শিষ্য-চ্যালা, যারা অধিকাংশই অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব-রিক্ত, সামাজিকভাবে অপাঙক্তেয়। ভাসানীরও ছিল লক্ষ লক্ষ মুরিদ, তাদের অধিকাংশই ছিল শোষিত-বঞ্চিত-ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষ। দুজনেই অধ্যাত্মসাধক হিসেবে

ভূমিকা পালন করেছেন, কিন্তু লড়াইয়ের ময়দান থেকে চুল পরিমাণ পিছু হটেননি। হাল আমলে বেঁচে থাকলে, ফকির লালনও পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী লড়াইয়ে সামনের কাতারের সেনানী হিসেবে সামিল হতেন। তিনিও শোষণহীন-মানবিক সমাজ কায়েমের লড়াইয়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট কিংবা র্যাডিক্যাল বামপন্থীদের সহগামী হতেন। ভাসানীর মতো হয়তো-বা তাকেও জেলে যেতে হত কিংবা জেলে বসে অনশন-ধর্মঘট করতে হত।

লালন বেঁচে থাকলে জিন্নাহ-গান্ধীর ধারার রাজনীতি করতেন না বা করতে পারতেন না। তাঁর পূর্বসূরি হতেন সুভাষ বসু যিনি ছিলেন মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি। পাকিস্তানি জাানায় বেঁচে থাকলে জিন্নাহর চালবাজির রাজনীতি লালন মানতে পারতেন না, যেমন পারেননি ভাসানী। গান্ধীর সঙ্গে খানিকটা মিল থাকলেও তাঁর ধর্মীয় আবরণে মোড়ানো রাজনীতিও লালনের কাছে গ্রহণযোগ্য হত না। গান্ধী অহিংসবাদী হলেও অর্থনৈতিক সমতায় বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু লালন ও ভাসানী দু জনেই সমতাভিত্তিক সমাজ-দর্শনে বিশ্বাস করতেন। জিন্নাহর মতো গান্ধীও ছিলেন সমাজের উঁচুতলার মানুষ। গরিবানা হালে, দীনদরিদ্র বেশে ঘোরাফেরা করলেও গান্ধীর পেছনে কংগ্রেস ও ভারতের জাতীয়তাবাদী অভিজাতদের যে প্রচুর খরচ হত সেটা আর কোনো গোপন ব্যাপার নয়। সাজপোশাকে, ফ্যাশান-স্টাইলে, বক্তৃতার ভাষাভঙ্গিতে হেরফের থাকলেও গান্ধী ও জিন্নাহ দুজনেই ছিলেন বড়লোকদেও নেতা। লালন ও ভাসানী দু জনেই ছিলেন নিচুতলার মানুষ ও খাঁটি বাঙালি। তারা নিজের মতো করে জীবনযাপন করে গেছেন। দুজনেই গরিব-দুঃখী, নিঃস্ব-রিক্ত তথা ব্রাত্যজনকে ক্ষমতায়িত করতে চেয়েছেন। লালন যে ভাসানীর মতো আপসহীনভাবে কৃষক-শ্রমিক তথা আমজনতার সামগ্রিক মুক্তির জন্য কাজ করে যেতেন তা বলাই বাহুল্য।

লালন ও ভাসানী দুজনেই মুক্তিপিয়াসি সংগ্রামী পুরুষ, কিন্তু তাদের সংগ্রামের কাফেলা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয়ের শীর্ষবিন্দু ছুঁতে পারেনি, দেখে যেতে পারেননি রোদ-ঝলমলে মানবিক সমাজ । সুনির্দিষ্ট কোনো সাংগাঠনিক-পরিকাঠামো বা ব্যবস্থাপনাও রেখে যেতে পারেননি আগামী প্রজন্মের জন্য। তবে দুজনের মধ্যেই মানবমুক্তির স্বপ্ন ছিল। উঁচু-নিচু, আশরাফ-আতরাফের ভেদ ঘুঁচিয়ে জাতকূল-গোত্রহীন মুক্ত-মানবসমাজের বলে গেছেন লালন। তবে লালন-দর্শন বাস্তবায়নের জন্য যে-উচ্চায়ত চিন্তার মানুষ বা শিষ্যবর্গ প্রয়োজন ছিল সেটা লালন ও তার সাক্ষাৎ শিষ্যরা বানাতে পারেননি। লালন-উত্তর দুদ্দু শাহ, মনিরুদ্দীন শাহ, বেহাল শাহ, শুকচাঁদ ফকির, অমূল্য গোঁসাই,

মহেন্দ্র ক্ষ্যাপারা আসর-মাতানো গায়ক ছিলেন, কিন্তু লালনীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করার মতো মনস্তাত্ত্বিক ও সাংগাঠনিক শক্তি ছিল না। ভাসানীও বুঝেছিলেন বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি সমতাভিত্তিক স্বাধীন ভূখণ্ড প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর মুরিদ ও অনুসারীরা ভাসানীর লালিত স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন করতে পারেননি। যদি পারতেন তাহলে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের রূপ-চেহারা, রাজনীতির চালচিত্র অন্য রকম হতে পারত। ভাসানী ও লালনকে নিয়ে বিতর্ক আছে, আগামীতেও থাকবে, তারপরও দুজন জনমানস ও পরিসরে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবেন। যে কারণে রুমি-রবীন্দ্রনাথ, গালিব-ইকবাল থেকে নজরুল-সুকান্ত বেঁচে থাকবেন, ওই একই কারণে লালন ও ভাসানী মানব মুক্তির সুহৃদ-সারথি, গাইড-ফিলোসফার হিসেবে বেঁচে থাকবেন।

লেখক: অধ্যক্ষ (ভা.), মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ। ফোন: ০১৮১৬-৬৯৩৪

১৬ বছর পর গাংনীর রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির কাউন্সিল

দীর্ঘ ১৬ বছর পর বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (২০ এপ্রিল) দুপুরে রাইপুর ইউনিয়নের কেএবি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এই কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে মোট ৪৫৯ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন রবিউল ইসলাম, হাফিজুর রহমান ও হাসিবুল ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী ছিলেন খলিলুর রহমান ও জাফর আলী।

কাউন্সিল শুরুর আগে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

আয়োজক কমিটির সদস্য আব্দুল আওয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য আলমগীর খান সাতু, আমিরুল ইসলাম, কাজী মিজান মেনন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আখেরুজ্জামান, আলফাজ উদ্দিন কালু, গাংনী পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইনসু এবং জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী।

জনসভা পরিচালনা করেন জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য আব্দাল হক।

সমাবেশ ও ভোটগ্রহণ ঘিরে স্থানীয় নেতাকর্মীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেতা নির্বাচনের এমন উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা।

আগামীকাল সোমবার গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “দেশব্যাপী তৃণমূলের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটিগুলো পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে গাংনী উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও একটি পৌর ইউনিটে দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব ইউনিটের নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে। এর লক্ষ্যে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নিয়ে কাউন্সিল আয়োজন কমিটি গঠন করা হয়েছে।”

সোস্যাল মিডিয়া, ভিউ ও তরুণ

প্রজন্ম

প্রত্যেক মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি হলো অন্যের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা। অতীতে মানুষ নিজের মেধা, বুদ্ধি, আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্ব না দর্শনগত উপস্থাপনার মাধ্যমে অন্যের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করত। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির অভাবনীয় পরিবর্তনের ফলে নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য প্রযুক্তিগত পন্থাকে ব্যবহার করছে। এসব পন্থার মধ্যে অন্যতম হলো মোবাইল অ্যাপস টিকটক, ফেসবুক রিলস, ইন্সটাগ্রাম। এই সব অ্যাপসের মাধ্যমে ১৫ সেকেন্ড, ৩০ সেকেন্ড যেকোনো ভিডিও তৈরি করা যায় এবং যা খুব সহজেই তা অন্য কোনো সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা যায়। আবার অন্য কারো তৈরি করা কোনো গান বা অভিনয়ের মধ্যে ঠোঁট মিলিয়ে নিজের অভিনয়শৈলী প্রকাশ করা যায় টিকটকের মাধ্যমে।

টিকটক একটি মোবাইল এ্যাপস হলেও এর নেতিবাচক প্রভাব তরুণ প্রজন্মকে বিশেষ করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বাস্তব থেকে। এদের মধ্যে উগ্রতা, অশালীনতা, অশ্লীলতা, কল্পনাপ্রবণতার মতো বিভিন্ন জটিল মানসিক রোগ তৈরি করছে। অতিরিক্ত টিকটকের ব্যবহারের ফলে মানসিক ভারসাম্যহীনতা, বাস্তবতার প্রতিবিমুখতা, মনস্তাত্ত্বিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক অবনতির মতো ভয়ানক জটিল মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে।

টিকটক অ্যাপসের ব্যবহারের কারণে এমন কিছু নেতিবাচক ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে ভিডিও আপলোডকারীকে জীবনের ইতি টানতে হয়েছে। প্রায়শই পত্রিকার বদৌলতে জানা যায়, টিকটক ভিডিও বানাতে যেয়ে ট্রেনে নিচে কাটা পড়ে কিশোরের মৃত্যু বা ভিডিও বানাতে যেয়ে ট্রেনে উপর থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু। প্রাইমারী স্কুলে পড়া ছাত্রী ভিডিও বানাতে গিয়ে মৃত্যু। এমন খবর হরহামেশাই শোনা যায়। বস্তুত শিশু-কিশোর, তরুণ কিংবা বৃদ্ধ কেউই বাদ পড়ছে না টিকটক আসক্তি থেকে। শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ এসব ভিডিও তৈরি কিংবা উপভোগ করতে গিয়ে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়কে হারিয়ে ফেলছে নিজের অজান্তেই। যে সময়ে তাদের সিলেবাস শেষ করার কথা, সে সময়টাতে তারা টিকটক নামের এই অপ্রয়োজনীয় এবং সময় অপচয়কারী প্লাটফর্মে নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছে।

টিকটক নতুন মিডিয়া। তরুণ সমাজ এর সঙ্গে কতটুকু কীভাবে যুক্ত সেই

বিষয়গুলো দেখার আছে। পাশাপাশি এর ইতিবাচক দিকও তো আছে। আমাদের যারা নীতিনির্ধারক অনেক সময় তাদেরও বোঝাপড়ায় ঘাটতি থাকে। তারা ক্রিটিক্যালভাবেই বিষয়টা দেখে। টিকটকের সবাই মনে করে, বখাটেরাই এটা ব্যবহার করে। এটা কোন ভদ্র মানুষের কাজ না। টিকটককে যে ধরনের কনটেন্টের মধ্যে ফ্রেমিং করা হয়, টিকটক কিন্তু সেই ধরনের কনটেন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। সেখানে কিন্তু ভালো কনটেন্টও থাকতে পারে। অনেকে ভালো কনটেন্টও বানাচ্ছে। সেটা মজার হতে পারে, শিক্ষামূলক হতে পারে, বিনোদনমূলক হতে পারে। সেই সুস্থ্য বিষয়টা এখানে অনেক ক্ষেত্রেই মিসিং হয়ে যায়। খারাপের দিকেই মানুষের আগ্রহ বেশি।

টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট, ফেসবুক, ইউটিউব সব জায়গায় এই শর্ট ভিডিও কনটেন্টের ছড়াছড়ি। বিনোদন নেওয়ার বাহানায় রিলসে ঢুঁ মারার স্বভাবও হয়ে গেছে ব্যবহারকারীদের। অথচ কয়েক সেকেন্ডের এই রিলসগুলোই কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে, মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে অজান্তে, বিষণ্নতা উপহার দিচ্ছে, মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে করছে এসব ক্ষতি হচ্ছে হচ্ছে?
সামাজিক মাধ্যমের স্ক্রলিং ক্যাফেইনের নেশার মতো। অফুরন্ত কনটেন্ট ডোপামিনের ফিডব্যাক লুপ সৃষ্টি করে। যা থেকে মনোযোগ সরানো একেবারেই সহজ নয়। এভাবে শুধু সময়ই অতিবাহিত হয় না, বরং কাজের ক্ষমতাও চলে যেতে থাকে আঙুলের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে।

রিলস আকারের ছোট ভিডিওগুলো একেতো সংক্ষিপ্ত, চটকদার, তেমনি আবার বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রেও চমৎকার। র্যাপিড ফায়ার ফরম্যাটের রিলসগুলো কোনোকিছু মনেই রাখতে দেয় না। কয়েকটি ভিডিও দেখার পর কোন ভিডিওর পর কোনটি মনে থাকা দুষ্কর। কয়েকটি মনে পড়লেও অধিকাংশই স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। কারণ রিলস প্যাসিভ ভিউকে উৎসাহিত করে, যেখানে কোনো ভিডিও স্থায়ী প্রভাব ফেলে না। রিলস স্বল্পমেয়াদী স্মৃতির মতো ক্ষণস্থায়ী। আর অস্থায়ীত্ব ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয় ভীষণভাবে। উদ্দেশ্য ছাড়া স্ক্রল করতে থাকলে জ্ঞানীয় ক্ষমতা ও মনোযোগ দুর্বল করে দেবে ব্যাপক হারে। চলমান ডিজিটাল বিপ্লবকালে নৈতিক উদ্বেগ নিয়ে সমালোচনা করতে গেলেও রিলসের প্রভাব অবহেলা করা যাবে না। রিলসের রোলারকোস্টার মানসিক সুস্থতার ওপরও প্রভাব ফেলছে।
ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামেও রয়েছে রিলস, ইউটিউবে শর্টস। আলাদা নাম হলেও জিনিস কিন্তু একই। কনটেন্টগুলো হয় খুবই আকর্ষণীয়। এই শর্ট ভিডিও গুলো, আস্তে আস্তে মানুষকে আবেগশূন্য করে দিচ্ছে, কারও

মৃত্যুর খবরে এখন আমাদের কষ্টের স্থায়িত্বকাল মাত্র ৩ সেকেন্ড, কোনো দুর্ঘটনার খবর আর আমাদের শরীরকে অসার করে দেয় না, মনে কষ্ট নিয়ে আঙুলের ইশারায় ফোনস্ক্রিন স্ক্রল করে নিচে নেমে কোনো কৌতুকপূর্ণ রিলে পরমুহূর্তেই আমাদের ঠোঁট প্রসারিত হয়, চোখে আনন্দের ছাপ পরিলক্ষিত হয়, আমরা পরিণত হই আবেগহীন, যন্ত্রমানবে…

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এখন বহু মানুষের উপার্জনের একটা ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আর এই উপার্জন করতে লাইক, ভিউ বেশি লাগে। বেশি ভিউ বা লাইক পেতে দ্রুত জনপ্রিয় হয় এমন সব কনটেন্ট তৈরি করছে তরুণেরা। পাশাপাশি নিজেকেও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে জাহির করার একটা চেষ্টা আছে। এই কাজ করতে গিয়ে তারা এমন সব কনটেন্ট তৈরি করছে যা বাংলাদেশে আইনে অপরাধ।

সস্তা জনপ্রিয়তা সমাজে নতুন করে দেখা দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া আসার পরই এটা বেশি করে দেখা যাচ্ছে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কনটেন্ট তৈরি করে তারা বেশি লাইক বেশি ভিউ মাথায় রাখে। এটার দুটো দিক আছে। একটা সরাসরি অর্থনৈতিক দিক, আরেকটি হল সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে জাহির করা। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করা। অর্থনৈতিক দিকটা হল, কারও পেজে যদি অনেক লাইক বা কনটেন্টে অনেক ভিউ হয় সেটা ফেসবুক বা ইউটিউবে বা অন্য কোন মিডিয়ায় তাহলে সেটা মনিটাইজ করা সম্ভব। সেখান থেকে অর্থ উপার্জন করাও সম্ভব। এই অপশনটার কারণে মানুষ এখন বেশি ভিউ, বেশি লাইকের পিছনে ছুটছে। এই বিষয়গুলো সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবহারকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এখানে যতটা না অর্থনৈতিক তার চেয়ে বেশি মনস্তাত্ত্বিক। কারণ তারা নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে জাহির করতে চান।

সম্প্রতি ভাইরাল খ্যাত ক্রিম আপা বা কিরিম আপার বেশ কিছু ভিডিও টিকটিক বা ফেসবুকে আসছে। কখনো কড়া রাসায়নিকে মেয়ের চুল রং করে দিচ্ছেন। কখনো মাথার চুল ন্যাড়া করে দিচ্ছেন। কান ফুটো করার বন্দুকের মতো যন্ত্র দিয়ে কান ফুটো করে দিচ্ছেন। কানে ভারী কানের দুল পরিয়ে কড়া মেকআপ করাচ্ছেন। বাজে গালি দিচ্ছেন, মেয়ের মুখের সামনে থেকে খাবার কেড়ে নিচ্ছেন, মেয়ের মুখে কুলি ফেলাসহ, ধমক দেওয়া, ঘুমন্ত মেয়েকে ঠেসে খাওয়ানো, চড় মারাসহ নানা কাজ করে যাচ্ছেন ক্যামেরার সামনে। শুধু মাত্র ভিউ পাওয়ার আশায় একজন মা এমন নির্দয়মূলক কাজ করে যাচ্ছেন।

আবার উদ্যোক্তার কথা না বললেই না। রোবাইত ফাতিমা তনি ফেসবুকে

পণ্য নিয়ে লাইভে এসে অশালীন ভাষায় গালাগালি করে। কখনো আবার লাইভেই সালোয়ার পরে দেখাচ্ছেন। বয়সের অসামঞ্জস্য স্বামীকে লাইভে এনে সুগার ড্যাডি খ্যাতি দিয়ে দর্শকের মন মাতিয়ে ভিউ বাড়াচ্ছে। কখনও আবার মায়া কান্না করে পণ্য বিক্রি করছেন।

তবে একটু ভালো করে খেয়াল করলে বোঝা যায় এরা মানসিকভাবে অসুস্থ। ভিডিওর কমেন্ট বক্স ভরে বাজে কমেন্টে। এদের কাছে একটাই মুখ্য বিষয় হল ভাইরাল হলেই ভিউ। এই ভিউ কনসেপ্ট প্রজন্মকে আকৃষ্ট করে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে ।
এখন প্রশ্ন হতে পারে সোসাল মিডিয়ার কারণে কী তরুণরা অপরাধমূলক কাজে উৎসাহিত হচ্ছে?

সোশ্যাল মিডিয়া হল বিজনেস মডারেট সামাজিক নেটওয়ার্ক। প্রথমে বিষয়টা এমনই ছিল। উৎসাহিত করার বিষয়ে সরাসরি তাদের দায়ী করতে পারবেন না। ওরা চায় যে কোনো প্রকারে মানুষ এটাতে যুক্ত থাকবে। যত ব্যবহারকারী বাড়বে তত তাদের লাভ। সেজন্য তারা সিস্টেমটাকে সেভাবে সেট করে। যে কনটেন্টগুলো মানুষ বেশি দেখে সেগুলোকে তারা সামনে এনে দেয়। পরোক্ষভাবে দায়ী হলেও সরাসরি বলা যাবে না। এখানে ব্যক্তির দায় যেমন আছে, তেমনি সমাজের অপরাপর মানুষেরও দায় আছে। একটা খারাপ ভিডিও এত ভাইরাল হবে কেন? এখানে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে শিক্ষারও একটা দিক আছে। ঠিকমতো বোঝার একটা বিষয় আছে। চটকদার কিছু হলেই আমরা সেটাতে ক্লিক করি। এখানে ব্যবহারকারী হিসেবেও আমাদের একটা দায়িত্ব আছে এবং বোঝার ব্যাপার আছে। আমি কিন্তু একটা জিনিস দেখলাম আর সেটা শেষ হয়ে গেল, তেমন না। এখানে আমারও কিন্তু দায় আছে।

আমরা যখন কৈশোর পেরিয়েছি তখন পর্ণ বা পর্ণগ্রাফি শব্দ শুনলেই আড়ষ্ট হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন এই বিষয় নিয়ে নেই কোনো আড়ষ্টতা, নেই সহজাত লজ্জা। বরং ছোট বাচ্চাদের থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে পর্ণগ্রাফিতে আসক্তির মাত্রা ভয়াবহ আকারে বেড়ে চলেছে। এর কারণ হলো ইন্টারনেটে এসব ভিডিও বা অডিওর সহজলভ্যতা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন ব্লগ, রিলস, টিকটক ভিডিওর উসকানিমূলক প্রচারণা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অন্যের আনন্দময় মুহূর্ত উপভোগ করতে করতে নিজের অবস্থার সঙ্গে অহেতুক তুলনা করছি আমরা। কোনো ট্রেন্ড দেখলে তা অনুকরণ করার প্রতিযোগিতা নেমে পড়ছি? অথচ কারোর জীবনই মসৃণ নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সকলে ইতিবাচকতা

তুলে ধরে। মুদ্রার বিপরীত দিকের চিত্র কখনো দেখা যায় না রিলসে। এতে করে অসন্তুষ্টি ও বিষণ্নতা জাপটে ধরছে।
তবে টিকটক রিলসের মাধ্যমে একাকিত্ব কাটানোর উপায়, ব্যবসার বিজ্ঞাপন, পণ্যের প্রচার, সচেতনতামূলক তথ্য পাওয়া যায় তা মানতে হবে। তবে এটির বিনিময়ে ইনফ্লুয়েন্সার, ভøগারদের কনটেন্ট আমাদের থেকে যে প্রতিদান নিচ্ছে তা বিস্তর বটে। আদান-প্রদানের এই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার আগেই বাস্তবতা প্রাধান্য দিয়ে চলতে হবে। যতটুকু সম্ভব কাজে ব্যস্ত থেকে রিলসের আসক্তি এড়িয়ে চলতে হবে। মনে রাখবেন, সুন্দর মেকি জীবন নয়, অসুন্দর বাস্তবতাই আমাদের সঙ্গী। বর্তমান সময়ে আমাদের আপন সমাজের কেমনতর অবয়ব তা সচেতন সামাজিক মাত্রেরই জানা। তথাপি নানাবিধ অপরিহার্য ব্যস্ততা হেতু আপন স্বার্থেই আপন চেহারা অবলোকন করে নেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ফেসবুকের নীল দুনিয়ায় গ্রন্থাগার হারিয়ে যাচ্ছে

১৮৫০ সালে যুক্তরাজ্যে পাবলিক লাইব্রেরি এ্যাক্ট পাশ হয়। যদিও সেই আইন পাশ করতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অভিজাত ও রক্ষণশীল সদস্যগনের অনেকে শিক্ষা ও সচেতনতা তৈরীর কাজে রাজকোষের অর্থ ব্যয়ের বিপক্ষে ছিলেন। তারপরেও আইনটি পাশ হয়ে যায়। ওই আইন পাশের পর ১৮৫৪ সালে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় ৫টি গণগ্রন্থাগার। এগুলো হলো যশোর, বগুড়া, রংপুর, বরিশাল ও হুগলি পাবলিক লাইব্রেরি। যেসময় এসব লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হয় সেসময়ও কলকাতা বিশ^বিদ্যালয় গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার অধিকার পায়নি।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দ্য ব্রিটিশ ওয়ার্কম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, ইংল্যান্ডের কুম্ব্রিয়া অঞ্চলের আটটি গ্রামে একটি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ক্রিয়াশীল অবস্থায় রয়েছে। জর্জমুর নামক একজন সমাজসেবী ব্যবসায়ী ভালো ভালো সাহিত্যকর্মকে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এই প্রকল্পর সৃষ্টি করেন। আমাদের দেশে বিশ^সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। অধ্যাপনা করেছেন তিনি ১৯৬২ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত ত্রিশ

বছর ধরে। তিনি অনুভব করেছেন যে, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রয়োজন আলোকিত মানুষ। ১৯৭৮ সালে তিনি বিশ^সাহিত্য কেন্দ্র ও ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন।

২৩ বছর বয়সের আসাদের বাড়ি জামালপুর জেলার সরিষা বাড়িতে। পড়াশোনার পাশাপাশি রাজমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করেন। এলাকায় বই পড়ার অভ্যাস গড়াতে ২০১৮ সালে ২০টি বই নিয়ে একটি পাঠাগার চালু করেন। তার পাঠাগারে দুই হাজারের বেশী বই এখন। আসাদ আশপাশের গ্রামগুলোর যুবকদের বই পড়ার অভ্যাস গড়াতে নিজে সাইকেল চালিয়ে বড়ি বাড়ি গিয়ে বই দিয়ে আসেন। আগের দেয়া বই নিয়ে আসেন। এলাকার কতশত জন এখন তার পাঠাগারে বসে জ্ঞান অর্জন করছে। পাঠাগারটির একটি ফেসবুক গ্রুফ আছে। সেখানে আছে বইয়ের তালিকা। গ্রুপের সদস্যরা গ্রুপে লেখকের ও বইয়ের নাম জানালেই আসাদ সাইকেল চালিয়ে বই পৌছে দেন। দিনমজুর বাবার সবচেয়ে ছোট ছেলে আসাদ এই পাঠাগার নির্মাণ করে আকাশ হয়ে গেছেন। কেউ তাকে আর ছুঁতে পারেনা।

অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে পলান সরকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি টানেন। কিন্তু বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলেন। পলান সরকারের নানা ময়েন উদ্দিন সরকার স্থানীয় ছোট জমিদার ছিলেন। নানার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ৪০ বিঘা সম্পত্তির মালিক হন। পলান সরকার রাজশাহী জেলার ২০ টি গ্রামজুড়ে গড়ে তুলেছেন অভিনব শিক্ষা আন্দোলন। নিজের টাকায় বই কিনে তিনি পড়তে দেন পিছিয়ে পড়া গ্রামের মানুষদের। প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে কাঁধে ঝোলাভর্তি বই নিয়ে একেকদিন যেতেন একেক গ্রামে। বাড়ি বাড়ি কড়া নেড়ে আগের সপ্তাহের বই ফেরত নিয়ে নতুন বই পড়তে দেন। এলাকাবাসীর কাছে তিনি পরিচিত ‘বইওয়ালা দাদুভাই’ হিসেবে। ২০০৯ সালে রাজশাহী জেলা পরিষদ তার বাড়ির আঙিনায় একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১১ সালে সামাজসেবায় অবদানের জন্য রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদক লাভ করেন। ২০১৯ সালের ১ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পলান সরকারও আকাশ হয়ে গেছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আসাদ, পলানের মতো মানুষের জন্ম হয়েছে। তাদের অনেকেই আকাশ হতে পেরেছেন। আমরা তাদের স্মরণ করিনা।

বই হচ্ছে জ্ঞানের ভান্ডার তাই প্রতিটি লাইব্রেরি, স্কুলে গ্রন্থাগার হচ্ছে জ্ঞান ভান্ডারের একটি স্থান বা উৎস। তাইতো লাগোস হোপ দেশে দেশে ঘুরছে বই নিয়ে। যেমন আমাদের দেশে ঘোরে গাড়ি ভর্তি বই নিয়ে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি। ১৯৭০ সাল থেকে জার্মাণ ভিত্তিক জিবিএ শিপ থরে থরে সাজানো বই নিয়ে বিশ^ব্যাপি বিভিন্ন

দেশের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে ১৯৭০ সালে দুটি জাহাজভর্তি বই নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। এপর্যন্ত ১৫১ দেশ ভ্রমন করেছে। অথচ আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরিগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

স্কুল লাইব্রেরি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে জ্ঞান আহরণের জন্য নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু গ্রন্থাগারগুলো মুখো হন না শিক্ষার্থীরা। গ্রাম, শহর ও পাড়া মহল্লার লাইব্রেরিগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। সর্বশেষ ঐতিহ্যবাহী মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরি কোটাবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে বন্ধ। একমাত্র সরকারি গ্রন্থাগারটিতেও চলছে পাঠক খরা।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ঢিলছোড়া দুরত্বে সরকারি বিশাল গ্রন্থাগারে তাকে তাকে সাজানো দেশ-বিদেশের বই। ঝকঝকে তকতকে উন্নতমানের কাঠের চেয়ার-টেবিল আর টাইলস করা মেঝে। অতি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও আধুনিকতার ছোঁয়া থাকার পরও পাঠকশূন্য গ্রন্থাগার। পাঠক খরায় ভৌতিক পরিবেশ গ্রন্থাগারটিতে। এমন অবস্থা দেখা গেছে মেহেরপুরে সরকারি গণগ্রন্থাগারে।

১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ড. শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কের সামনে একটি ভাড়া ভবনে সরকারি গণগ্রন্থাগারটির যাত্রা শুরু। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ওয়াবদা সড়কে এডভোকেট আফরোজা বেগমের বাড়ির নিচতলায় ভাড়া বাড়িতে ছিলো কুড়ি বছর। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে সরকারি কলেজ থেকে ঢিলছোড়া দুরত্বে নিজস্ব ভবনে গ্রন্থাগারটির উদ্বোধন হয়। প্রথম দিকে সেখানে অনেক পাঠক ছিলো। তবে ক্রমে পাঠকশূন্য হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিনন্দন গ্রন্থাগারটির। পাঠক ফেরাতেও নেই কোনো উদ্যোগ। অথচ গ্রন্থাগারটিতে পাঠকদের জন্য ৩৭ হাজার ৫০৫টি বই রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ধর্মীয় ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই। অভিধানসহ ইংরেজি ভাষারও বেশ কিছু বই এখানে রয়েছে। এছাড়া গ্রন্থাগারে প্রতিদিন ৫টি বাংলা, ২টি ইংরেজি দৈনিক ও বেশ কয়েকটি ম্যাগাজিন রাখা হয়। এখানে এক সঙ্গে ৩০ জন পাঠকের নিরিবিলি পরিবেশে বসে বই পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। সেখানে শিশুদের জন্য পৃথক পাঠচক্র ব্যবস্থা আছে। শহরের একপ্রান্তে হবার কারণেই এখানে পাঠক কমে গেছে।

জেলা শহরে আছে সরকারি কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরি (গ্রন্থাগার) আছে, কিন্তু প্রাণহীন। নেই পাঠকের কোলাহল। আলমারিতে বন্দি বই, হয়তো খোলাই

হয় না বহুদিন। কোথাও বইয়ের কিছু সংগ্রহ আছে, তবে তাকে লাইব্রেরি বলা চলে না। কোথাও কোথাও লাইব্রেরিয়ান থাকলেও অযত্ন-অবহেলায় পড়ে আছে বইগুলো, যেন অনেকটাই অভিভাবকহীন। এমনচিত্র মেহেরপুরের সরকারি-বেসরকারি লাইব্রেরি ও সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। মানুষকে আলোকিত করতে শতবছর আগে ১৯২২ সালে এক দানশীল শহরের বুকে ৯৭ শতাংশ জমি দান করে তাঁদের স্বর্গীয় বাবার নামে প্রতিষ্ঠা করেন ‘যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী’। ১৯৩৯ সালে তদানীন্তন এসডিও এবং পদাধিকার বলে সভাপতি এ. আর. রহমান এই লাইব্রেরিটি সম্প্রসারণ করেন এবং নতুন নামকরণ করা হয় মেহেরপুর পাবলিক ক্লাব। স্বাধীনতা উত্তরকালে বেশ কয়েক বছর ক্লাবটি বন্ধ থাকে। ৮০র দশকে ফের লাইব্রেরিটি চালু হলেও ২০০০ খ্রিস্টাব্দকালীন সময় থেকে রাজনীতি, কমিটির মধ্যে অভ্যন্তরীন বিরোধসহ নানামুখি কারণে পাঠক খরা দেখা দেয়। কোটাবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে জেলার সবচেয়ে বয়স্ক এই গ্রন্থাগার ‘মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরি’ আর খোলা হচ্ছেনা। লাইব্রেরিটি তালাবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানটির লাইব্রেরিয়ান খন্দকার সামসুজ্জোহা সোহাগ একটি মামলায় পলাতক আছে। সাবেক এক লাইব্রেরিয়ানের বয়ানে- একটা সময় লাইব্রেরি নিয়ে কোন রাজনীতি ছিল না। এখন রাজনীতি জায়গা করেছে লাইব্রেরিতে।

মেহেরপুর জেলা শহরে আলেয়া কামেল মাদ্রসা লাইব্রেরি কক্ষে গিয়ে দেখা যায়, সেটি মূলত লাইব্রেরি নয়, কক্ষের এককোণে আলমারিতে কিছু বই রাখা। শিক্ষার্থীরা বলছে, সেটিই নাকি তাদের লাইব্রেরি। শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার সম্পর্কে তেমন ধারণাই নেই।

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় দাঁড়িয়ে রয়েছে ভবনকে বুকে নিয়ে। সেই ভবনে কাগজ কলমে ২৯শ বইয়ে ভরা গ্রন্থাগার। তিনবছর আগে পাওয়া বই এখনও প্যাকেট বন্দি হয়ে। গ্রন্থাগারে এসএসসি পরীক্ষার কাগজপত্রসহ, স্কুলের পুরাতন খাতা ও অন্যান্য সামগ্রিতে ভরা। অনেকটা স্টোর রুম হিসেবেই ব্যবহার হচ্ছে গ্রন্থাগারটি। করোনাকালীন সময় থেকে কোনদিন গ্রন্থাগার খোলা হয়নি। বইগুলো রয়েছে দুরাবস্থায়। দির্ঘবছর লাইব্রেরিয়ান পদটি শূন্য। বিদ্যালয়ের ধর্ম শিক্ষক মোসস্তাফিজুর রহমান ও ইংরেজি শিক্ষক বাসাদ আলী মর্নিং ও ডে শিপটে লাইব্রেরিয়ানের দায়ীত্বে আছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরিমুখো হন না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানান, স্কুলের গ্রন্থাগার নিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি

অভিযোগ আছে। প্রতিবছর ভর্তির সময় তাদের কাছ থেকে লাইব্রেরি ফি নেয়া হয়। কিন্তু তাদের বই নিতে হলে আবেদন করে বই নিতে হয়। তাছাড়া প্রতিদিনই গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে। দশম শ্রেনির এক শিক্ষার্থী জানান- বই পড়ার মাধ্যমে, তারা নিজেদেরকে নতুন জিনিস, নতুন তথ্য, সমস্যার সমাধান করার নতুন উপায় অর্জনের মাধ্যমগুলো খুঁজে পায়। কিন্তু কোনদিন লাইব্রেরি খোলা হয় না। বেশ কয়েখজন শিক্ষার্থী জানান- গ্রন্থাগার নিয়ে কথা বললে স্যারেরা পরে বকা দেবেন। শিক্ষার্থীরা স্বীকার করেন গ্রন্থাকার কোনদিনই খোলা থাকেনা।

মর্নিং শিফটের লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্বে থাকা ধর্ম শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমানের সাথে সরেজমিনে গ্রন্থাগারে গিয়ে বই প্রদানের রেজিস্ট্রারে গত তিন বছরে কোন শিক্ষার্থীর নামে বই ইস্যু করা দেখা যায়নি। দেখা যায় বইয়ের আলমারির পাশে এসএসমি পরীক্ষার বস্থাবন্দি খাতা, স্কুলের পুরাতন রেজিস্টারসহ অন্যান্য সামগ্রিতে ভরা। একটি চৌকিও দেখা যায়। ওই চৌকিতে কম্পিউটারের পিন্টারসহ বিভিন্ন সামগ্রি। মোস্তাফিজুর জানান- পাঠ্যভাস কর্মসূচির ৪৮৪টি মিলে মোট বই রয়েছে ২৮৮৪টি। এই করোনাকালীন সময় থেকে কোন ছাত্র গ্রন্থাগারমুখো হয়নি। নাম প্রকাশে একজন শিক্ষক জানান- সপ্তাহে একদিন ভ্রাম্যমান বই লাইব্রেরি আসে স্কুলে। কোন শিক্ষার্থী ওই ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি থেকেও বই পড়েনা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শরিফুল ইসলাম জানান- আমরা নিয়মিতভাবে লাইব্রেরি ব্যবহার করার জন্য আমাদের ছাত্র/ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করি। শিক্ষকদের প্রতি রাস্ট্রিয় নির্দেশ রয়েছে কোন শিক্ষার্থীর সাথে উচ্চস্বরেও কথা বলা যাবেনা। ফলে শিক্ষার্থীদের শাসনের মধ্যে আনা যায় না। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যভাস গড়ে তোলাসহ শিক্ষকদের অনেক নির্দেশই উপেক্ষিত থেকে যায়।

মেহেরপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিনের বয়ানে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুমে আর বই রাখার আলমারি শোভা পায় না। লাইব্রেরির চেয়ারে বসে বই পড়ার দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। মানুষের অবসর সময় ঢুকে গেছে ফেসবুকের নীল দুনিয়ায়, টুইটারের কলরবে ইনস্টাগ্রাম নামক অনলাইনে। আমাদের মনের মগজ দখল করে নিয়েছে নতুন নতুন ডিভাইস।

আমাদের দেশের লাইব্রেরিগুলো বন্ধ হবার আরেকটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মার্ক এলিয়েট জাকার বার্গের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এই মাধ্যমটি এখন বিশে^র কোটি কোটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে নীল

দুনিয়া মাধ্যমগুলো।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, সভাপতি মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব ও যুগান্তর প্রতিনিধি

বর্তমান সংবাদমাধ্যম ও মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্ভাবনা

বর্তমান সময়ে ঝুঁকির কেন্দ্রে অবস্থান করছে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম। জুলিয়ান এসাঞ্জ থেকে জামাল খাশোগি, মিয়ানমারের সাংবাদিক ওয়া লোন এবং কিয়াও সোউ থেকে সাগর- রুনি। যারা নিজেদেরকে মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে রেখে অনন্য সাংবাদিকতার নজির সৃষ্টি করেছিলেন। বর্তমান যুদ্ধবিধ্বস্ত প্যালেস্টাইনে দায়িত্বশীল সাংবাদিক নিধনের ভয়াবহতা বিশ্বকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে।

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের এই মাধ্যমটি নিয়ে বিস্তর সমালোচনা রয়েছে। পরতে পরতে যেমন রয়েছে হলুদ সাংবাদিকতার ঘেরাটোপ, কর্পোরেট আগ্রাসনে বিপন্ন হয়ে পড়ার উদাহরণ। তেমনই রয়েছে ইতিবাচক দৃষ্টান্তও। দেশি -বিদেশি সংবাদযোদ্ধাদের নির্ভীক দায়িত্বশীলতার কারণে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বৈশ্বিক সমর্থন সহজ হয়েছিল। আবার একাত্তর পরবর্তী সময়ে সংবাদমাধ্যমগুলো বস্তুনিষ্ঠতার পরিসর সৃষ্টি করতে না পারাই বিভিন্ন আকৃতির ফ্যাসিবাদেরও উত্থান হয়েছে।

গণমাধ্যমের দায়িত্ব কেবল বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে সক্ষম হওয়া নয় বরং পাঠকের মনে ইতিবাচকতাকে সংক্রমিত করা, জনগণকে সজাগ করে তোলা। বিশেষভাবে অনাধুনিক ও চিন্তাগতভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে।
বাংলাদেশের গণমাধ্যম দুটি মোটা দাগে বিভক্ত। একভাগের কাজ হলো ক্ষমতার বাইরে থাকা রাজনৈতিক দলের হয়ে ক্ষমতামুখি গতিস্রোত তৈরি করা। অন্যভাগে ক্ষমতার পক্ষে অবস্থান করে সুবিধা গ্রহণ আর ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করার নির্লজ্জ প্রবাহ তৈরি। যার ফলে এখানে

নজিরবিহীন দুর্নীতির রেকর্ড তৈরি হয়েছে। কেবলমাত্র সংবাদমাধ্যমের নির্লিপ্ততায় অনেক মন্ত্রী এমপিসহ কর্মকর্তা কর্মচারীরা লাগামহীন দুর্নীতির সুযোগ পেয়েছে। আল-জাজিরার অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত না হলে হয়তো জানাই যেতোনা জেনারেল আজিজ ও তার ভাইদের কীর্তি কিংবা সাবেক ভূমিমন্ত্রীর লন্ডনের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ৩৬০ টা বাড়ি সহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অগাধ সম্পদের ফিরিস্তি।

বিশ্বস্ত গণমাধ্যমের অভাবে সমাজ, রাষ্ট্র ও জনমত গঠনের পর্যায়প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। শাসকের চোখে চোখ রেখে চেতনার কোন স্ফুলিঙ্গ সংবাদমাধ্যম গুলো জ্বালতে পারেনি। বরং ক্ষেত্রবিশেষ গণতান্ত্রিক চর্চায় প্রতিকূল পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ধারণায় যুক্ত করা সময় বিবেচনায় অনিবার্য। কিন্তু মানবতার পরিধির ধারণা কেবল স্বদেশে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিশ্বজনীন। সংবাদ মাধ্যমকে দেশকাল ধর্মের ঊর্ধ্বে থেকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম যদি গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দল বা উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করে তখন তার সম্ভাবনাময় আদর্শিক জায়গাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উগ্র দেশপ্রীতিও অন্য দেশের মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। পশ্চিমা গণমাধ্যমের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে অশান্ত করে রেখেছে দশকের পর দশক।

সম্প্রতি বাংলাদেশের ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সংবাদমাধ্যম ও অনলাইন পোর্টালে যে তর্কযুদ্ধ বা সংবাদ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে তা দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান স্বাভাবিক সম্পর্কগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। এজন্য গণমাধ্যমকে পেরিয়ে যেতে হয় দেশ কালের সীমা।

গণমাধ্যমের এমন দশার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের পশ্চাদপদ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একমাত্র জনপ্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিনের ভবিষ্যৎ কি? এমন প্রশ্ন স্বাভাবিক। মারাত্মকভাবে বিভাজিত এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের কথা বলা, মানুষের বুকের স্পন্দন ও অপ্রাপ্তির দীর্ঘশ্বাসকে অনুবাদ করে প্রকাশ করা এ কঠিন কর্মযজ্ঞ। তার উপরে রয়েছে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মতো কঠিন বিষয়। মেহেরপুর প্রতিদিনের সপ্তম বর্ষ পেরিয়ে অষ্টম বর্ষে পদার্পণ একটি বিস্ময়। এটি টিকে আছে কেবল কয়েকজন মানুষের শ্রম ও আন্তরিক পরিচর্যার কারণে। সংবাদমাধ্যমের টিকে থাকা সহজ হয়

তখনই যখন সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা মানুষ অনুভব করতে পারে। সামাজিক অসঙ্গতি, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যেখান ব্যক্তির একক লড়াই অসম্ভব, সেখানে সংবাদমাধ্যম সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
মানুষের কন্ঠস্বর হয়ে প্রতিবাদের ভাষা জোরালো করে। সংবাদমাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যেমন সহযোগিতা করে তেমনি জনগণকেও তার দায় সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। যে কাজটি মেহেরপুর প্রতিদিন সাবলীলতার সাথে করে চলেছে। আর তার টিকে থাকার কারণও সেটি। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রয়োজনে নয় বরং সকলের প্রয়োজনেই এর বেঁচে থাকা জরুরি। এই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে দ্রুত জাগরিত হোক।
মেহেরপুর প্রতিদিনের জন্য শুভকামনা।

লেখক: শিক্ষক , কবি ও উপস্থাপক।